সাতদিন

খালেদ বিন হেদায়েতকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ

৪ মার্চ : নওগাঁয় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায় এবং হামলাকারীদের মধ্যে খালেদ বিন হেদায়েত নামে এক যুবক পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে।

রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ সোনালী ব্যাংক জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট শাখায় একদল সশস্ত্র ডাকাত ম্যানেজারসহ ১০ জনকে অস্ত্রের মুখে স্ট্রং রুমে আটকে রেখে ১৭ লাখ টাকা নিয়ে যায়।

সাংবাদিক হারুন-অর-রশিদ খোকনকে হত্যার প্রতিবাদে এবং খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত।

৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশে বিনিয়োগ, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ প্রদান এবং বিদেশে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে যাদের অবদান রয়েছে তাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর গুরুত্বপূর্ণ অনাবাসী বাংলাদেশী (আইএনআরবি) নির্বাচনের বিষয়ে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হবে বলে অস্ট্রেলিয়ায় এক প্রবাসী সমাবেশে জানান।

লালবাগে এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৩০০ কারখানা ও ২২০০ বস্তিঘর ভস্মীভূত এবং প্রায় শতাধিক আহত।

মহিমা হত্যা মামলায় অপহরণ, গণধর্ষণ ও এতে সহযোগিতার অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক আবু সাইয়ীদের বিরুদ্ধে ৪৬ লাখ ৮৮ হাজার ২৮২ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পিরোজপুরে বিএনপি-আওয়ামী লীগের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষে প্রায় ১০ ব্যক্তি আহত।

শেখ হাসিনার অভিযোগ

৬ মার্চ : জাতীয় স্বার্থে তেল-গ্যাস সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটি পল্টন ময়দান থেকে সিলেটের বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড অভিমুখে লংমার্চ শুরু করেছে।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের উদ্যোগে এক অর্থনৈতিক সংলাপে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বর্তমান সময়ে উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন।

নওগাঁয় বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর হামলার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাজধানীতে এক প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

তেঁতুলিয়া উপজেলায় বুড়াবুড়ি সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় ঘটে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া

৭ মার্চ : রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ৬০৬টি লোকসানি শাখা বন্ধ করে দেবে বলে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানিয়ে দিয়েছে।

সরকারি অফিসে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের আইনগত বাধ্যবাধকতা বাতিলের লক্ষ্যে সংসদে বিল পেশ করা হয়েছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় সারা দেশে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালিত হয়েছে।

৮ মার্চ : রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা মোতায়েন করা হবে না, তবে এলাকাভিত্তিক 'ব্লক রেইড' করা হবে বলে মহানগর পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন ও দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে এসিডদগ্ধ নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।

আগারগাঁওয়ে বিএনপি বস্তি ও লালবাগে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় পাঁচশ' ঘর ভস্মীভূত।

৯ মার্চ : বিরোধী দল পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন করা হবে বলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জানান।

চট্টগ্রাম বন্দরের একদল উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক চট্টগ্রাম প্রথম আদালতে বিচারকাজ চলা অবস্থায় অতর্কিত হামলা চালায় এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে।

১০ মার্চ : প্রশাসনে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আবারো হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগকে অস্বীকার করে সংবাদিক সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন।

বস্ত্রখাতে এন্টি ডাম্পিং প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সরকারের আশু হস্তক্ষেপ দাবি করেছে।

৭ মার্চ ও আওয়ামী লীগ

৭ মার্চে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভা

বাঙালির রক্তস্নাত মাস মার্চ। সাতই মার্চ বাঙালির গৌরবদীপ্ত সংগ্রামী ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল দিন। এ দিন বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য তখনকার রেসকোর্স ময়দানে নেমেছিল বাঁধ ভাঙা মানুষের ঢল। বঙ্গবন্ধু উত্তাল এ জনসমুদ্রে প্রদীপ্ত গলায় সমবেত জনতার উদ্দেশে বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা প্রস্তুত থেকো। মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়েই সমবেত জনতা মুক্তি সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেবার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। সেদিন তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণা দিয়েছিলেন। বিগত বছরগুলোতে একারণেই ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ ও সহযোদ্ধা সংগঠনগুলো সাড়ম্বরে পালন করে আসছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন থাকাকালীন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ জাতীয়ভাবে পালিত হয়েছে। পাড়ায়, মহল্লায় মাইকে বেজেছে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ। এ ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়েছে জনতা, নতুন প্রজন্ম। অথচ এ বছর ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ দায়সারা ভাবে পালন করেছে। শুধুমাত্র ধানমন্ডির বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আর পল্টনের সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই ৭ মার্চের কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বিএনপি-জামায়েতের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবারও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করে উপস্থাপনের অভিযোগ উঠছে। তীব্র বিতর্ক চলছে স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে। পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানের নাম লেখা হয়েছে। এ কারণে এ বছর ৭ মার্চের গুরুত্ব ছিলো আরো বেশি। মাত্র পাঁচ মাস ক্ষমতার বাইরে থাকা আওয়ামী লীগ এ গুরুত্ব বুঝতে পারেনি।

সরকারের প্রচার মাধ্যমগুলো নির্লজ্জভাবে এড়িয়ে গেছে ৭ মার্চের গুরুত্ব। বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াগুলো সরকারের বিরাগভাষণ হতে পারে এ ভয়ে আপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দিয়ে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরেছে। আওয়ামী লীগ সকালে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়ির প্রতিকৃতিতে ফুল ও পল্টনে সমাবেশ করেছে। সাধারণ জনগণ কোনো পাড়া বা মহল্লা থেকে ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মাইকে শুনতে পায়নি। অথচ বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগ স্বউদ্যোগেই সাড়ম্বরে ৭ মার্চ পালন করেছে। অঙ্গ সংগঠনগুলো নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

৭ মার্চ আওয়ামী লীগ বিকালে আয়োজন করেছিল পল্টনের জনসভা। দুপুর থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল পল্টনে আসতে থাকে। বিকাল ৫টায় বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। সমাবেশে তিনি বলেন, আজ সংসদে নাকি বিল আনা হবে, জাতির জনকের ছবি নামানোর জন্য। বিলে নাকি বলা হয়েছে অনেকে জাতির পিতা মানেন না। শেখ হাসিনা বলেন, কিছু রাজাকার আলবদর ছাড়া আর সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মানেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

তিনি বলেন, যারা জাতির পিতার ছবিকে ভয় পায়, যারা ছবি নামাতে অস্থির হয়ে গেছে, তাদের বলি, ছবি দেয়ালে থাক বা না থাক বাংলার মানুষের মনের মণি কোঠায় তিনি থাকবেন। শেখ হাসিনা বলেন, সরকার গত ৫ মাসে যা দেখিয়েছেন তাতে তারা নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছেন। তিনি বলেন, দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলার মানুষ তাদের রুখে দাঁড়াবে। অত্যাচারীদের পতন হবেই। তাদের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। সমাবেশে বারবার স্লোগান দেয়া হয়, জাগো জাগো বাঙালি জাগো। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা।

নির্বাচনের ভরাডুবির পর সারা দেশে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা বেশ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। ৭ মার্চের থানা জেলা ওয়ার্ড পর্যায়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করে সংগঠনের ভিতকে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী করতে পারতো। এ সুযোগ আওয়ামী লীগ হাতছাড়া করেছে। ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান শরিক বিএনপি ৭ মার্চের গুরুত্বকে অবহেলা করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকেই খাটো করেছে। ইতিহাসের রথকে থমকে দিতে চেয়েছে। জোট সভানেত্রী হয়তো ভুলে যাননি, নির্বাচনের পূর্বে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন জাতীয় নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম। তার এই সহনশীলতার কারণে দেশের অনেক উদারপন্থিদের ভোট তার বাক্সে পড়েছে। নির্বাচনের পূর্বে ও পরে তার বৈপরীত্যপূর্ণ মনোভাব সচেতন মানুষকে হতচকিত করছে। তার একগুঁয়ে আচরণ গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথকে আরো বন্ধুর করে তুলছে।

জয়ন্ত আচার্য

বস্তিতে আগুন

রাজনীতি না দুর্ঘটনা

রিকশাচালক কফিলউদ্দিন। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে রোজগার করে। দুই ছেলে এক মেয়ের সংসার চালাতে স্ত্রীকেও গার্মেন্টসে কাজ করতে হয়। দু'জনের আয়ে তাদের সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। আগারগাঁও বিএনপি বস্তিতে এক রুমের ঘরটিতে ছোট একটি টিভিও ছিল। এছাড়া বিছানাপত্র, কিছু নগদ সঞ্চয় এবং স্ত্রীর একজোড়া কানের দুল। প্রতিদিনের মতো তাদের পুরো সংসারটি ঘুমিয়ে ছিল নতুন সকালের প্রত্যাশায়। কিন্তু জ্বলন্ত দানব ভোর হতে দেয়নি। তার আগেই কেড়ে নিয়েছে সব সম্পদ। এতো দিনের টুকরো আয় সম্পদ সবই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়েছে। জীবনের সর্বস্ব দিয়ে বাঁচাতে চেয়েছে সম্পদ, কিন্তু পারেনি। চোখ খুলে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে দেড় বছরের শিশুপুত্রকে কাঁধে নিয়ে ছুটতে হয়েছে নিরাপদ স্থানে। ফিরে এসে কিছুই পায়নি, জ্বলন্ত কাঠের টুকরো ছাড়া।

গত এক সপ্তাহের মধ্যে নগরীতে তিনটি বড় অগ্নিকান্ডে লাখ লাখ টাকার সম্পদ পুড়েছে। গৃহহারা হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ইসলামবাগ, লালবাগ ও বিএনপি টিবি বস্তির গৃহহারা মানুষ এখন রিক্ত, শূন্য। প্রতিবছর এ সময়টাতে দেশে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। প্রায় প্রতিটি অগ্নিকান্ডের ঘটনার পেছনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটকে দায়ী করা হয়। ফলে অগ্নিকান্ডের কারণ নিয়ে জনমনে নতুন কোনো ভাবনার উদয় ঘটে না। গত বছর সারা দেশে প্রায় ৬ হাজার অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে সম্পদের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২৫ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্তরা অধিকাংশই খেটে খাওয়া শ্রেণী। দুর্ঘটনার পর সরকার প্রশাসন থেকে সাময়িক কিছু সহায়তা পেলেও পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনের উদ্যোগ কখনই নেয়া হয় না। সরকারি তরফ থেকে পুনর্বাসনের জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের নাম-ঠিকানা নেয়া পর্যন্তই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদেরই আবার নতুন করে ভাবতে হয় কি করবে, কোথায় যাবে।

ঢাকা শহরে ছোট বড় মিলে প্রায় ৩০০ বস্তি রয়েছে। এসব বস্তিতে হাজার হাজার মানুষ বাস করে। যার

খুলনায় সাংবাদিক হত্যা

৮ বছরে ১০ জনের প্রাণহানি

অপরাধপ্রবণ এলাকা খুলনায় আবারো সাংবাদিক খুন। দুর্বৃত্তের তপ্ত বুলেটে এবার প্রাণ হারিয়েছেন খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সাহসী সাংবাদিক হারুন-অর-রশীদ খোকন। এ নিয়ে গত ৮ বছরে ১০ সাংবাদিকের প্রাণহানি ঘটলো খুলনা অঞ্চলে।

২ মার্চ শনিবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭টা। দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে সাহসী সাংবাদিক রশীদ খোকন মোটরসাইকেলে গ্রামের বাড়ি থেকে অফিসে যাচ্ছিলেন। তিনি মুজগুন্নি নেছারিয়া মাদ্রাসার সন্নিকটে পৌঁছালে আগে থেকে ওঁৎপেতে থাকা দুর্বৃত্তদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। রাজপথ রঞ্জিত হয় একজন কলম সৈনিকের রক্তে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। ঘটনার প্রায় ১০ দিন পার হয়ে গেছে। খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকরা এ ঘটনায় অনেক শোক, অনেক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। রশীদ খোকনের বিধবা স্ত্রী আর ৩ ছেলে- মেয়ে বুঝতে পারছে না তারা কি করবেন? বাকরুদ্ধ তারা। তাদের অপলক দৃষ্টি আর হাহুতাশে দেয়ানা গ্রামের বাতাস এখনো ভারী। স্বজন হারানোর বেদনা আর অব্যাহত সাংবাদিক নিধনে এ অঞ্চলের কলম সৈনিকরাও ভবিষ্যৎ নিয়ে

নিহত সাংবাদিক রশীদ খোকন

বিচলিত। এই অবস্থায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীও ঘুরে গেছেন খুলনা থেকে। তিনি রশীদ খোকনের বাড়ি গিয়ে প্রচলিত কিছু আশ্বাসের কথাও শুনিয়েছেন। ব্যস এ পর্যন্তই। অতীতে সংঘটিত আরো কয়েকটি সাংবাদিক হত্যাকান্ডের মতো রশীদ খোকন হত্যাকান্ডও একই পথে এগুচ্ছে। কারা এবং কেন রশীদ খোকনকে হত্যা করলো তার কোনো সুরাহা এখন পর্যন্ত পুলিশ করতে পারেনি।

এ হত্যাকান্ড অনেক কারণেই ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কারণে ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়েও কেউ কেউ খুন হতে পারে। কিন্তু রশীদ খোকনের ব্যাকগ্রাউন্ড পর্যালোচনা করলে অন্তত এমনটি কেউ ভাবেন না। কারণ ১৪ বছরের সাংবাদিকতার জীবনে তিনি গাড়ি-বাড়ি কিছুই করতে পারেননি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একজন সাহসী সাংবাদিক হিসেবে তিনি খুলনায় যে স্থান করে নিয়েছিলেন তার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তিনি এক সময় জুট মিলে শ্রমিকের কাজ করতেন। এর ফাঁকে তিনি এসএসসি পাস করেন। তবে অর্থাভাবে আর এগুতে পারেননি। ১৯৮৭ সালে তিনি দৈনিক পূর্বাঞ্চলে ছাপাখানার কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন। এক পর্যায়ে তার মেধা ও যোগ্যতা

মধ্যে প্রায় সবাই খেটে খাওয়া শ্রমিক। গ্রামাঞ্চলের নিষ্ফলা আবাদি জমি যখন তাদের অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে পারে না, সরকার প্রশাসন যখন তাদের দিতে পারে না রোজগারের উপায়, তখনই তারা ছুটে আসে রাজধানীর বুকে। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা পেতে তারা খেটে চলে দিনরাত। রাতের মশার কামড়, অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি পরিবেশের পর রোদ, বৃষ্টি, শীত। তারপরও বস্তিবাসী বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। কিন্তু নিয়তি তাদের এখানেও অসহায় করে রাখে। দৈব দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যা কিছু থাকে সেটাও খোয়াতে হয়।

গ্রাম থেকে আসা মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে বস্তিঘর। কিন্তু সরকার গ্রাম থেকে আসা মানুষকে যেমন ঠেকাতে পারছে না, তেমনি শহরেও তাদের দিচ্ছে না মাথা গোঁজার ঠাঁই। নগরীর অধিকাংশ বস্তিই গড়ে উঠেছে সরকারি জায়গায়, অবৈধভাবে। এসব বস্তি ব্যবহারও হচ্ছে অবৈধ কাজে। নগরীর বড় বড় সন্ত্রাসীদের আনাগোনা এসব বস্তিতে। সন্ত্রাসীদের টার্গেট বস্তিকে কেন্দ্র করে মাদক ব্যবসা পরিচালনা করা। সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীদের অভয়ারণ্য হিসেবে আগারগাঁও বিএনপি বস্তির ভালো সুনাম আছে। সরকারি তরফ থেকে মাঝে মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করলেও কোনো লাভ হয় না। কারণ সরকার এসব ভাসমান বস্তিবাসীকে পুনর্বাসন করে উচ্ছেদ করে না বলে তারা আবার অন্য কোথাও গিয়ে বস্তি গড়ে তোলে। কখনও ঘুরে ফিরে আগের জায়গাতেই ফিরে আসে।

সরকার বস্তিবাসীকে স্বীকৃতি না দিলেও রাজনৈতিক পরিমন্ডলের আদলে সরকারও চায় না বস্তিবাসীকে উচ্ছেদ করতে। কারণ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বস্তিগুলো প্রতিটি দলের জন্য ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। তাই যে কোনো দুর্ঘটনার পর নেতা-নেত্রীরা চলে যায় দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের কাছে। নামমাত্র সহযোগিতা দিয়ে অনুগ্রহ পাবার কামনা করে। গেল সপ্তাহের তিনটি অগ্নিকান্ডকে কেউ কেউ রাজনৈতিক নাশকতা হতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন। কারণ সামনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। আর এই নির্বাচনে বস্তিবাসীর ভোট প্রতিটি প্রার্থীর জন্য কাঙ্ক্ষিত। তাই ইসলামবাগের বস্তিতে অগ্নিকান্ডের পর চার মন্ত্রী ছুটে গেছেন ঘটনাস্থলে। জামায়াত ইসলামের আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদিসও এসেছেন দুর্গতদের মাঝে। মন্ত্রী, নেতারা সাহায্য দিয়ে কামনা করছে এই বাস্তুহারারাই তাদের ভোট দেবে।

যে বৈদ্যুতিক তারের শর্ট সার্কিটকে অগ্নিকান্ডের কারণ হিসেবে সব জায়গাতেই চিহ্নিত করা হয় তাও বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ। ডেসা কর্তৃপক্ষের মতে, নগরীর বস্তিগুলোতে ডেসা বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমতি দেয়নি। ফলে বস্তিবাসী যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তা অবৈধ। তবে ডেসা জানিয়েছে, বস্তিগুলোতে বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার পরিকল্পনা আছে।

নগরীর বস্তিগুলো বেশিরভাগই পরিচালিত হচ্ছে সন্ত্রাসী ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে। তারা সরকারি জায়গায় ঘর তুলে ভাড়া দেয়। সরকারি জমি, বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ করে তারা বস্তির মালিক হয়ে উঠেছে। সরকার বা প্রশাসনের এ বিষয়গুলো অজানা নয়। তারপরও সরকার এসব বস্তিবাসীর পুনর্বাসনের কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। সরকার এদের শহরে কিংবা গ্রামে পুনর্বাসন করতে পারলে সরকারের কোটি টাকা লোকসান বাঁচানো, সন্ত্রাস দমন এবং পরিবেশের উন্নয়ন ঘটনো সম্ভব হবে। আর খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে রাজনৈতিক কারণেই হোক কিংবা নিয়তির টানেই হোক নিঃস্ব হতে হবে না।

জাকির হোসেন

রশীদ খোকনের পরিবারের কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সান্ত্বনা বাণী

দেখে পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ তাকে শিক্ষানবিস রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ দেয়। তারপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শ্রম এবং নিষ্ঠা দিয়ে নিজেই নিজের শক্ত ভিত গড়ে তোলেন। চরমপন্থি, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত আর সমাজের মুখোশধারী অমানুষদের যমে পরিণত হন তিনি। অনেক প্রলোভন আর ভয়ভীতি দেখিয়েও কোনো লাভ হয়নি। যে কারণে তার পরিচিতি ছিল ডানপিটে সাংবাদিক হিসেবে।

২ মার্চ সন্ধ্যায় তিনি যখন গুলিবিদ্ধ হন তখন তার সম্বল বলতে একটি মোটরসাইকেল, একটি মোবাইল ও একটি ভিটেবাড়ি। আর সে কারণেই পুলিশসহ অনেকেই নিশ্চিত অন্তত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে বিরোধে জড়িয়ে তিনি খুন হননি। খুন হয়েছেন সাহসী ও আপোসহীন সাংবাদিকতার কারণেই। তার লেখনীতে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো এক পক্ষই তাকে হত্যা করেছে। ইতিপূর্বে একই কারণে যেভাবে খুন হয়েছেন শামছুর রহমান, সাইফুল আলম মুকুল, স.ম আলাউদ্দিনসহ অন্যান্যরা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, খুলনাকে বলা হয় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির ক্যান্টনমেন্ট। রশীদ খোকন বরাবর তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় লিখতেন। যে কারণে তিনি তাদের টার্গেটে পরিণত হন। একাধিকবার তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। সম্প্রতি খুলনায় আদালতে পুলিশ হেফাজত থেকে পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির বিভাগীয় প্রধান আব্দুর রশীদ তপনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তার সহযোগীরা। রশীদ খোকন এ বিষয়েও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখেন। এতে চরমভাবে ক্ষেপে যায় দলটির ক্যাডাররা এবং পথের কাঁটা হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাকে সরিয়েই দেয়। এছাড়া আরো দুটি পক্ষ সাংবাদিক রশীদ খোকনকে হত্যা করতে পারে বলে এলাকাবাসী ও পুলিশ ধারণা করছে। চরমপন্থিদের পাশাপাশি খুলনার শীর্ষ চোরাচালানি হিসেবে পরিচিত ব্ল্যাকার শামছুর লোকজন অথবা দৌলতপুর এলাকার একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে রশীদ খোকনের কলম ছিল সব সময় সোচ্চার। এলাকাবাসীর মতে দৌলতপুর এলাকার সংঘবদ্ধ একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চাঁদাবাজি ও জবরদখল করে আসছিলো। রশীদ খোকন এসব বিষয় নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন লেখেন। সম্প্রতি ঐ চক্রের অন্যতম হোতা আসলাম শেখ দেয়ানা মধ্যপাড়ার সাখাওয়াত হোসেনের জমি জবরদখল করে নেয়। সাংবাদিক রশীদ খোকন ঐ জমি দখলমুক্ত করে প্রকৃত মালিককে বুঝিয়ে দেয়ার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আর এতেই ক্ষেপে যায় আসলাম শেখ। সে রশীদ খোকনকে দেখে নেয়ারও হুমকি দেয়। পুলিশ এসব বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং ইতিমধ্যে আসলাম শেখসহ ৩ জনকে গ্রেপ্তারও করেছে। এছাড়া মামলার আর কোনো অগ্রগতি নেই। পুলিশ এখনো নিশ্চিত হতে পারেনি বাস্তবে কারা এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। শামছুর রহমান, সাইফুল আলম মুকুল, স.ম আলাউদ্দিন হত্যা মামলার মতো এ মামলাটির শেষ পর্যন্ত অপমৃত্যু ঘটে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

মামুন রহমান *খুলনা থেকে*

ঢাবিতে ভবন নির্মাণ

কাটা পড়বে ৬০টি গাছ

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ** ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও ডাকসু ক্যাফেটোরিয়ার মধ্যবর্তী বৃক্ষরাজিশোভিত জায়গায় 'বাংলাদেশ-ইরান সেন্টার ফর পার্সিয়ান স্টাডিজ' ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইরান সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ ভবন নির্মিত হচ্ছে। অপরিকল্পিত এ স্থাপনা নির্মাণের জন্য প্রায় ৬০টির মতো গাছ কেটে ফেলতে হবে।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে ইরানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আকবর হাশেমী রাফসানজানী বর্তমান পুষ্টি ভবনের পাশে ফারসি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী সেখানে ফারসি ভবন নির্মিত না হয়ে অন্য ভবন নির্মাণ করা হয়। ফলে ফারসি ভবন নির্মাণের জন্য অন্য কোনো সুবিধাজনক জায়গা খোঁজা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন কমিটি অন্যান্য অনেক পরিত্যক্ত ও খালি জায়গা বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনের এ জায়গাটিকে ফারসি ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ইরানের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড: সাইয়্যেদ কামাল খাররাজি 'বাংলাদেশ-ইরান সেন্টার ফর পার্সিয়ান স্টাডিজ' ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থানে করেন।

ফার্সি ভবন হলে এই গাছ আর থাকবে না

এর পরপরই জায়গাটির চারপাশ বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। বিক্ষুব্ধ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভিত্তিপ্রস্তরের ওপরের অংশ ভেঙ্গে ফেললেও ভবন নির্মাণের আনুষঙ্গিক সব কাজ এগিয়ে চলছে। এ জায়গায় অবস্থিত প্রায় ৬০টি গাছও এ জন্য কেটে ফেলতে হচ্ছে। আম, লিচু, কাঁঠাল, কড়ই, পেয়ারাসহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও বনজ বৃক্ষ এখানে রয়েছে। এর মধ্য থেকে বেশ কিছু গাছ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাটার জন্য লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বিপুল সংখ্যক বৃক্ষ নিধন করে ফারসি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল স্থাপত্য নকশা পরিবর্তন করে এ ভবন নির্মিত হলে জায়গাটি ঘিঞ্জি রূপ ধারণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে বলে তারা মতামত প্রকাশ করেন। তাছাড়া লাইব্রেরির সামনের এ জায়গাটি তাদের মানসিক

কে এই রোকন

সুমন-পিন্টুদের নামের তালিকায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আরও একটি নাম রোকন। দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে দু'বছরের জন্য বহিষ্কৃত। ফলে ১৯৯৪-৯৫ তে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এখনও স্নাতক পাস করা সম্ভব হয়নি। তেমন কোনো বড়মাপের নেতা না হলেও ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের প্রস্তাবিত কমিটির যুগ্ম সম্পাদক। যদিও কমিটিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের অনুমোদন পায়নি। সম্প্রতি তার একটি পর্নো সিডি বাজারে বেশ আলোড়ন তুলেছে। ২৫-৩০ টাকার সিডিটি ৫০০ টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। আর এই পর্নোগ্রাফিটির মূল এবং একমাত্র নায়কই হচ্ছে রোকন। নায়িকাটি তারই এক আত্মীয়া, মতান্তরে ছোটবোনের বান্ধবী। ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রী। যার নামের আদ্যক্ষর 'ই'। মেয়েটির অজান্তেই দৈহিক মিলনের দৃশ্য ভিডিও করেছে রোকন। সেই ক্যাসেটটি বাজারে বিক্রি করে ইতিমধ্যে লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে রাজধানীর নিউমার্কেট সংলগ্ন রাফিন প্লাজার একটি সিডি ক্যাসেটের দোকান। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে রোকনকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনের জন্য তাকে বহিষ্কার করেছে।

এই পর্নো সিডির নায়কের পুরো নাম রোকুনুজ্জামান খান রোকন। বাবার নাম আব্দুল আলী খান। বরগুনা জেলায় দক্ষিণ আমতলী এলাকায় তাদের বাড়ি। এসএসসি পাস এলাকায় ইন্দুখালি ইছহাক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সালে এবং ১৯৯৪ সালে প্রখ্যাত নটর ডেম কলেজ থেকে স্টার মার্কসহ এইচএসসি পাস করে। তার দু'ভাইয়ের একজন ডাক্তার আর একভাই মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। এলাকায় মেধাবী পরিবারের ছাত্র হিসেবে পরিচিত রোকন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই ক্যাডার ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হওয়ার কারণে বঙ্গবন্ধু হলের ছাত্র হলেও সে হলে উঠতে পারেনি। ফলে সে সময় ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত জহুরুল হক হলেই সে থাকতো। প্রথমে ছাত্রলীগের মন্টু গ্রুপের (সম্প্রতি বিএনপিতে যোগদানকারী মোস্তফা মহসীন মন্টুর নামে) কর্ণধার মাসুম আহমেদের হাতেই রোকনের অস্ত্র রাজনীতির হাতেখড়ি। যা তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে। তার সহযোগী বন্ধুদের মাধ্যমে পাওয়া গেছে আরও অবাক করা তথ্য। বন্ধুদের তরল আড্ডায় রোকন ছিল বরাবরই নিস্পৃহ। এসব আড্ডায় তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। মেয়েলি অর্থাৎ মেয়ে সংক্রান্ত যে কোনো আড্ডাই সে এড়িয়ে চলতো। অস্ত্রের প্রতি ছিল রোকনের প্রচন্ড দুর্বলতা। নতুন নতুন অস্ত্র সংগ্রহ, এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন, হল দখলে বন্দুক যুদ্ধে যাওয়ার প্রতি তার নেশা ছিল প্রচন্ড রকম। জহুরুল হক হল সংলগ্ন বস্তি (এখন উঠিয়ে দেয়া হয়েছে) পলাশী, নীলক্ষেত ও কাটাবন এলাকা ছিল তাদের চাঁদাবাজির স্বর্গরাজ্য। রোকনের বন্ধুরা জানায়, যখন তারা হল গেট পাহারায় বসে মনোরঞ্জনের জন্য তরল আড্ডায় মেতে উঠত, রোকন তখন অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই বেশি পছন্দ করতো। সে তুলনামূলকভাবে কথা-বার্তাও কম বলতো।

রোকন

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়

প্রশান্তির জন্যও প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরি থেকে পড়াশোনা করে বেরোবার পর বৃক্ষশোভিত এ স্থানের সামনে বসে আড্ডার মাধ্যমে তারা নিজেদের পুনরায় পড়াশোনার জন্য তৈরি করে। তাই এখানে স্থাপত্য নির্মাণের সিদ্ধান্তে তারা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। আরো অনেক খালি জায়গা পড়ে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে বৃক্ষরাজিশোভিত এ স্থানেই কেন ফারসি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে– বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আজ এই প্রশ্ন। কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থেকে নয়, বরং 'অপরিকল্পিত স্থাপনা বিরোধী ছাত্র ঐক্য' নামক সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যানারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড: মোজাফফর আহমদও এতে অংশ নেন। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথোপকথনে তিনি বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যের ওপর নির্ভর করে তার চরিত্র ফুটে ওঠে। যেখানে সেখানে স্থাপত্য নির্মাণের ফলে এর সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যগুলোকে এর মূল নকশা পাশ কাটিয়ে যেভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে, তাতে

ভিত্তি প্রস্তরের প্রস্তুতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো চরিত্রই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ড: মোজাফফর আহমদ -এর মতে, ফারসি ভবনের জন্য ফারসির চরিত্র আনতে হবে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে প্রস্তাবিত জায়গায় ফারসি ভবন নির্মাণ করা কোনো মতেই উচিত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পরিত্যক্ত ও খালি জায়গা রয়েছে, সেখানেই এ ভবন নির্মিত হতে পারে। ব্যবসায় প্রশাসন ভবনের পাশে অবস্থিত টিনশেডগুলোর স্থানে ফারসি ভবন নির্মিত হলে অনেক কম গাছ কাটা পড়বে। এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব এলাকার ভেতর ধানমন্ডি থানা নির্মাণেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ স্থানেও ফারসি ভবন নির্মিত হতে পারে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ফারসি ভবন নির্মাণ সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে পর পর ৪ দিন যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। অফিসে থাকলে তিনি মিটিং-এ থাকেন আর অফিসে না থাকলেও তাকে বাসায় পাওয়া যায় না। এ ৪ দিন সন্ধ্যার পর থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত অসংখ্যবার তার বাসায় টেলিফোনের যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে বাসায় পাওয়া যায়নি। এতো রাত পর্যন্ত উপাচার্যের বাইরে কি কাজ থাকতে পারে? কদাচিত তাকে বাসায় পাওয়া গেলেও টেলিফোনে জানানো হয়, স্যার মিটিং-এ আছেন। তাকে দেয়া যাবে না। আসলে রহস্যটা কি?

'অপরিকল্পিত স্থাপনা বিরোধী ছাত্র ঐক্য' ব্যানারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গত ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাত ফেরিতে অংশ নেয়। এছাড়া ক্যাম্পাসে তারা মিছিল ও পোস্টারিং কর্মসূচি শুরু করেছে। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস যেন পরিণত না হয় ইট পাথরের স্তূপে' 'গাছ কেটে অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ বন্ধ কর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষা কর, মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে চাই', 'কবুতরের খোপে শ্বাস কষ্ট নয়' প্রভৃতি পোস্টারগুলো এখন শোভা পাচ্ছে কাটার জন্য নির্ধারিত ক্রস চিহ্নিত গাছগুলোতে। 'অপরিকল্পিত স্থাপনা বিরোধী ছাত্র ঐক্য' এ বিষয়ে পাঁচদিনব্যাপী গণসাক্ষরতা অভিযান শুরু করেছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা ছাড়াও ১০ মার্চ প্রতিবাদ মিছিলসহ উপাচার্যের কার্যালয়ে জমায়েত হয়।

জহুরুল হক হলটি ছাত্রলীগের শামীম আহমেদ গ্রুপ দখল করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে রোকনরাও এই গ্রুপে যোগ দেয়। '৯৭ সালের প্রথম দিকে হলটি রতন-তমি-বাবুল তালুকদার গ্রুপ দখল করলে তারা এই গ্রুপে যোগ দেয়। এ সময় ফরিদপুর গ্রুপের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া শহিদুল্লাহ ও এফএইচ হল দখল করতে গিয়ে ছররা গুলির আঘাতে রোকন আহতও হয়েছিল। লালবাগের রাশেদ শিকদারের (নিহত) নেতৃত্বে রোকন লালবাগ এলাকায় চাঁদাবাজি করতো। এই সময় রোকন জহুরুল হক হলের মন্ত্রীপাড়া বলে খ্যাত মেইন বিল্ডিংয়ের পূর্ব ব্লকেই বেশি থাকতো। তবে নির্দিষ্ট কোনো রুম ছিল না। ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও মিছিল-মিটিংয়ে তেমন অংশগ্রহণ করতো না। দলের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজিই ছিল মুখ্য বিষয়। জহুরুল হক হলের ক্যান্টিনে এখনও রোকনের নামে বাকি রয়েছে প্রায় ছয় হাজার টাকা।

১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতা পার্থ হত্যার মধ্যে দিয়ে ক্যাম্পাসের উত্তর পাড়ার হলগুলোও ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এ সময় রোকনও বঙ্গবন্ধু হলে চলে আসে। এই হলটি ছিলো প্রথমে গোপালগঞ্জ গ্রুপের দখলে। প্রকাশ্যে গোপালগঞ্জ গ্রুপ করলেও রোকন গোপনে বরিশাল গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম, কালা সেন্টুদের নেতৃত্বে হলটিতে বরিশাল গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। বিতাড়িত হয় গোপালগঞ্জ গ্রুপের সাদা সেন্টুরা। গোপালগঞ্জ গ্রুপের অধিকর্তারা এজন্য জুনিয়র গ্রুপ অর্থাৎ রোকনদের গ্রুপের বিশ্বাসঘাতকতাকেই দায়ী করেন। এ সময় হল শাখার সম্মেলনে রোকন সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীও হয়েছিল।

পরবর্তীতে হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি করা হবে এই বলে বরিশাল গ্রুপ রোকনকে আশ্বস্ত করে। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হলো বরিশালের অন্য একজন, কায়কোবাদ রানা। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম ও কায়কোবাদ রানার নেতৃত্বে এই হলটিতে আওয়ামী লীগের আমলে সাধারণ ছাত্রদের ওপর বিভিন্ন অজুহাতে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। সেই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলো রোকন। ক্ষমতার অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে বরিশাল এলাকায় মার্কেটিং বিভাগের ছাত্ররা হলের একটি ব্লক দখল করে নেয়। যার নাম দেয়া হয় 'মার্কেটিং ব্লক'। এই ব্লকেরই ২০৫ নম্বর রুমে রোকন থাকতো। যা পরিচিত ছিল ভিন্ন দল-মত ও অবাধ্য (!) সাধারণ ছাত্রদের নির্যাতন সেল। বঙ্গবন্ধু হলের ক্যান্টিনেও রোকনের বকেয়া রয়েছে প্রায় ১২ হাজার টাকা। যা শুরু থেকেই ছিল 'ফাও'-এর তালিকায়। রোকনের বন্ধুরা জানায়, সম্প্রতি রোকনের চরিত্র ছিল পুরোপুরি বিপরীত। প্রায়ই তার সঙ্গে সুন্দরী মেয়েদের দেখা যেত। যারা এই সিডিটি দেখেছেন তাদের মতে, এই মেয়েটি ছিল তার সর্বশেষ শিকার। এমনকি হলের রুমে মেয়েদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকলেও রোকন প্রভাব খাটিয়ে আগন্তুক মেয়েদের রুমে নিয়ে যেতো। ঘন্টার পর ঘন্টা রুমের দরজা বন্ধ করে রোকন তাদের সঙ্গে সময় (!) কাটাতো। এজন্য হলের ছেলেরা এই রুমটির নাম দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু হলের 'হেরেমখানা'। এক কথায় রোকন ক্যাডার থেকে সর্বশেষ প্লেবয় হিসেবে উপাধি পেয়েছিল।

বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অন্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের মতো রোকনও ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। এই সিডি প্রকাশের পর থেকে সম্পূর্ণরূপে সে পলাতক। তবে বর্তমানে রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় থাকে বলে জানা গেছে। একটি সূত্র জানায়, রোকন ফরহাদ নামের তার এক বন্ধুর দোকানে সিডিটি করতে দেয়। কিন্তু সেই বন্ধুটি চালাকি করে তা হার্ড ডিস্কে রেখে দেয়। ফরহাদের মাধ্যমেই তা বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

শিবির থেকে সাবধান

রিপোর্ট **আসাদুর রহমান**

ক্ষমতার অংশীদারিত্বের অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করেছে। এখন তারা রাজধানীর স্কুলগুলোতে সংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার চেষ্টা করছে। গড়ে তোলার চেষ্টা করছে ঢাকাভিত্তিক নেটওয়ার্ক। সংগঠনের ভিতকে শক্ত করতে বেছে নিয়েছে মহানগরীর প্রথম সারির স্কুলগুলো। তাদের কার্যক্রমের লক্ষ্য শুধু মাধ্যমিক নয় প্রাথমিক স্কুলের অবুঝ শিশু, কিশোর। এই শিশু কিশোরদের তারা আহবান জানাচ্ছে ইসলামী আন্দোলন ও জেহাদে শরিক হবার জন্য।

স্কুলগুলোতে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতে শিবিরের বিভিন্ন কমিটির কর্মীরা অংশ নিচ্ছে।

প্রচার-প্রচারণা এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমে তারা স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতির কোনোই তোয়াক্কা করছে না। তাদের সদস্য হবার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সরবরাহ করছে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডবিল, চটি বই, জেহাদ সংক্রান্ত ছড়াসমৃদ্ধ কার্ড ইত্যাদি। সরবরাহ করা চটি এবং হ্যান্ডবিলগুলোতে ছাত্র শিবিরের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সংক্রান্ত তথ্যাদি সংবলিত রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ইসলামী আন্দোলনে জেহাদে অংশ নিতে বিভিন্ন উত্তেজনাপূর্ণ তথ্যাবলী।

ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করানো সমর্থক ফর্মের অঙ্গীকারনামায় এই সংগঠনে যোগদানের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

৫ মার্চ সকাল দশটা। ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে তখন টিফিন পিরিয়ড। স্কুলটিতে অন্যান্য সময়ে অভিভাবকদের প্রবেশের অনুমতি না থাকলেও বাচ্চাদের জন্যে নিয়ে আসা খাবার খাওয়াতে স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সময়ে অভিভাবকদের স্কুল অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। এই সুযোগ নিয়ে ছাত্র শিবিরের ৩ কর্মী স্কুলটিতে ঢুকে পড়ে। স্কুলে ঢুকে তারা তিনজন আলাদা হয়ে বিভিন্ন ক্লাসে ঢুকে যায়। ক্লাসে ঢুকেই তারা দ্রুত হাতে বিভিন্ন হ্যান্ডবিল, চটি বই বিতরণ শুরু করে। একই সঙ্গে তারা ছাত্রদের দিয়ে প্রচুর সমর্থক ফর্ম পূরণ করিয়ে নেয়। তারা ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম শ্রেণীর শিশু-কিশোরদের রুটিন শিট, কার্ড দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফর্ম পূরণ করাতে থাকে। ৫ম শ্রেণীতে সরবরাহ করা একটি কার্ডে লেখা রয়েছে–

'খুনের ধারা বইবে যত
এই কাফেলা বাড়বে তত
রুখতে কি আর যায় পারা যায়
দীপ্ত জীবন খেলা।'

দশম শ্রেণীর 'ক' শাখার শিক্ষক সন্তোষ চন্দ্র সরকার তার ক্লাসে গিয়ে একজন শিবিরের কর্মীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তিনি ঐ শিবির কর্মীকে নিয়ে শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আবুল কালাম আজাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে, বলেন, আমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা বলে আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এসেছি। কিন্তু তাদের কথায় আমার সন্দেহ হয়। আমি তাকে প্রায় জোর করে প্রধান শিক্ষকের রুমে নিয়ে আসি। তখন সেই শিবির কর্মী নিজেকে ধানমন্ডি থানার ছাত্র শিবিরের সভাপতি দাবি করে বীরদর্পে স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। ধানমন্ডি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ হাবিবুল্লাহ খান সাপ্তাহিক

অ্যাডভান্স

২০০০কে বলেন, শিবির কর্মীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রকার অনুমতি না নিয়ে এই কার্যক্রম চালিয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর 'খ' শাখার রিয়াদ, অংকন, শাকিল, ইমতিয়াজ সমর্থক ফর্ম পূরণ করেছে। তারা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানায়, শিবির কর্মীরা তাদের পল্টন কার্যালয়ে যেতে বলেছে। সেখানে তাদের ছাত্র শিবিরের কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ ধারণা দেয়া হবে বলে তারা জানায়। শ্রেণী শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, এই অল্প সময়ের মধ্যে মাত্র ৩ জন শিবির কর্মী পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি শাখায় তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে।

যেসব ছাত্র সমর্থক ফর্ম পূরণ করেছে তাদের আগামীতে কিভাবে ছাত্র-শিবিরের কার্যক্রমে অংশ নেয়ানো হবে– প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র শিবিরের প্রধান কার্যালয়ে শহীদ জানায়, ঠিকানা অনুযায়ী আমরা সেসব ছেলেদের বাসায় যাব এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের বাসা থেকে নিয়ে আসবো। শহীদ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানায়, প্রতিটি ছাত্র সচেতনভাবে এই ফর্ম পূরণ করেছে। তাদেরকে জোর করে ফর্ম পূরণ করানো হয়নি। আমরা শুধু তাদের অনুপ্রাণিত করেছি।

প্রশ্ন হলো, পঞ্চম শ্রেণীর এক কিশোরের কতটুকুই বা বিচার-বিবেচনা হয়েছে যে, সচেতনভাবে সে একটি রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের সমর্থক হওয়া এবং সেই সংগঠনে যোগদান করার। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বয়সের কোটা যারা এখনও পার হতে পারেনি তাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজনৈতিক দলের কর্মী করে নেয়া নিতান্তই প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া যে সংগঠন ইসলামকে পুঁজি করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে মিথ্যার লেবাস পরে সংগঠনের কার্যক্রম চালায় তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। আর সে জন্যেই ধানমন্ডি স্কুলের বেশ কয়েকজন অভিভাবক তাদের ছেলেদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। অভিভাবক শামসুল হুদা সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, আমি চাই না আমার ছেলে এসবে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্তু আমি এবং আমার স্ত্রী ৯টা-৫টা অফিস করি। ছেলে বেলা ১২টায় বাসায় ফিরে। তখন যদি শিবির কর্মীরা বাসায় এসে ছেলেকে নিয়ে যায়।

রাজশাহী, চট্টগ্রামের পর শিবিরের থাবা এখন রাজধানীতে পড়তে যাচ্ছে। ওদের অমানবিক পৈশাচিক কর্মকান্ডে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েকশ' ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। এ কারণে শিবিরের হাত থেকে স্কুলের কোমলমতি ছাত্রদের রক্ষা করতে সচেতন অভিভাবকদের তৎপর থাকতে হবে।

ফেরিঙ্গি মারলে কি হয়

লিখেছেন **জেমস স্বপন পিরীজ**

নির্যাতিত সুবল মন্ডল

হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, আমাদের নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক চিত্র। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিদিনই আমাদের নজর কাড়তে বাধ্য করছে। কিন্তু বিগত ৩০ বছরে এ দেশে যে ঘটনাটি চোখে পড়েনি তা হলো সংখ্যালঘু নির্যাতন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেকটা আকস্মিকভাবেই আবির্ভূত হয়েছে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ সম্প্রীতির মাঝেই বসবাস করে আসছে।

সন্ত্রাসীদের তান্ডবে শিকার একটি রুম

রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সব ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবন যাপন খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ধর্মীয় মতপার্থক্যকে বড় করে তুলেছে। দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন, লুটপাট করে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সরকার প্রশাসন এ বিষয়ে নির্বাক। ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্যাতন শুরু হলে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী গিয়েছিলেন নির্যাতিতদের কাছে। ফিরে এসে খুব সাবলীলভাবেই বলেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি কিছুটা সত্য, কিছু অর্ধসত্য, কিছু অতিরঞ্জিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্য বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় তুলেছে। প্রতিকার মেলেনি। পুলিশ প্রশাসনও অনেকটা নির্বিকার। তাই পরিবর্তন ঘটেনি নতুন সন্ত্রাস 'সংখ্যালঘু নির্যাতন'।

সম্প্রতি পাবনার কৈলজানা, কদমতলী, সানপাই, কলিমহল ও নেংরিতে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান-এর মদদে তার ভাতিজা রুকনুজ্জামান (রুকনু), জনাব আলী মেম্বার, গওহর খানের তিন ছেলে জিন্নাহ্, মিন্নাহ্, মিঠু ওয়াহেদ খান, নাজিম উদ্দিন সরকার রশিদ, সাঈদসহ বেশ কিছু বিএনপি সমর্থক স্থানীয় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয় স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সুবল মন্ডল ও তার ভায়রা সুশান্ত পেরেরা। সন্ত্রাসীরা তাদের বাড়িঘর ভাংচুর করে এবং নারী-পুরুষকে বেদম প্রহার করে।

জানা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই এ অঞ্চলের আড়াই হাজার খ্রিস্টান সম্প্রদায় চাপের মুখে পড়ে। বিএনপি সমর্থকরা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে বিভিন্ন সময় চাঁদাবাজি করে। না দিলে মারধর করে এবং জীবননাশের হুমকি দেয়। খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মদ খাওয়ার রেওয়াজ আছে। এরই প্রেক্ষাপটে গত ঈদে সন্ত্রাসীরা তাদের কাছে চাঁদা ও মদ দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে তারা মানিক নামে একজনকে প্রহার করে।

এ এলাকার খ্রিস্টানদের আর্থিক অবস্থা

ভালো। এ কারণে খ্রিস্টান সম্প্রদায় বাড়ির নির্মাণ কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এবারের ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সন্ত্রাসীরা অত্র এলাকার প্রধান খ্রিস্টান ব্যক্তিদেরকে নির্দিষ্ট করে ২০টি চিঠি দেয়, ৫০০০ টাকা চাঁদা দাবি করে এবং মদ চায়। তারা ১৮ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় এনজিও YMCA-এর সেক্রেটারিকে চিঠি দেয় এবং চাঁদা দাবি করে। ঈদের দিন পর্যন্ত তারা বিভিন্ন খ্রিস্টানদের কাছে মদ ও চাঁদা দাবি করে। চাঁদা ও মদ না পেয়ে বিএনপি সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর চড়াও হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় জিন্নাহ, মিন্নাহ ও মিঠুর নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা সুশান্ত পেরেরার বাড়িতে তিন দফা হামলা চালায়। তারা বাড়ির লোকজনকে মারধর করে। সন্ত্রাসীরা হামলার সময় বলতে থাকে ফেরেঙ্গি মারলে কি হয়রে। গ্রামের অন্যান্য খ্রিস্টানরা সাহায্যের জন্য আসতে বাধা দেয় জনাব আলী মেম্বার ও তার লোকজন।

সুশান্ত পেরেরার বাড়িতে হামলার পর তার ভায়রা সুবল মন্ডল বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ শুরু করে বিচারের আশায়। এ খবর জিন্নাহ, মিন্নাহ ও তাদের সহযোগীদের কাছে গেলে তারা সুবল মন্ডলের ওপর চড়াও হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ত্রাসীরা তার বাড়িতেও হামলা চালায়, মারধর ও বাড়িঘর ভাংচুর করে।

সুবল মন্ডল-সুশান্ত পেরেরার বাড়িতে আক্রমণ ও খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন রাজনৈতিক হলেও এর পেছনে অর্থনৈতিক কারণও জড়িত। এ অঞ্চলের খ্রিস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ের কেউই এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা নয়। এখানকার প্রোটেস্ট্যান্টরা এসেছে গোপালগঞ্জ ও বরিশাল থেকে। আর ক্যাথলিকরা এসেছে গাজীপুর থেকে। সুবল মন্ডলের আর্থিক অবস্থা অন্যদের চাইতে ভালো। কৈলজানা বাজারে তার একটি দোতলা মার্কেট এবং ঢাকায় আবাসিক হোটেল আছে। এ কারণে গ্রামের অন্যদের চাইতে তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো। নির্যাতনের জন্য এটাও একটা কারণ।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের এটি পাবনার একটি চিত্র। বিভিন্ন সময়ে মিডিয়াতে সংখ্যালঘুদের নিয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রশাসন এখনও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। সরকারের প্রথম তিন মাসের তুলনায় নির্যাতন কমে এলেও থেমে যায়নি। বিএনপি নেতারা দলীয় ব্যানারে চালাচ্ছে এ নির্যাতন। তবে এ নির্যাতন বন্ধ করার এখনই সময়। তা না হলে ৩০ বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেস্তে যাবে।

ছবি: **এন্ড্রু বিরাজ**

রাত ১২টার জ্যাম

গভীর রাত। ঘন্টার কাঁটা তখনও ১২টা ঘরে পৌঁছেনি। কারওয়ান বাজারে বিশাল জ্যাম। সোনারগাঁও হোটেলের মোড় থেকে গাড়ির কিউ এসে ঢেকেছে ফার্মগেট পর্যন্ত। দিনের বেলায়ও সচরাচর এ ধরনের জ্যাম হয় না। বর্তমান সরকারের কয়েকটি সিদ্ধান্ত নগরীর অসহনীয় যানজটকে কিছুটা হলেও সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। রাস্তায় অবৈধ গাড়ি চলাচল বন্ধ, ২০ বছরের পুরাতন গাড়ি উঠিয়ে নেয়া, কয়েকটি রাস্তায় রিকশা চলাচল বন্ধ এবং বেবিটেক্সির ওপর নিয়ন্ত্রণ– এ সবই যানজট কমানোর ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু রাতে তো মানুষ কম, গাড়ির সংখ্যাও একেবারে কম, তারপরেও জ্যাম। গভীর রাতে এ জ্যামের কারণ কি?

গভীর রাতে মগবাজার মোড়ের জ্যাম

দিনের বেলা ভিআইপি রাস্তা জুড়ে বেবিটেক্সি থাকলেও গভীর রাতে পুরো রাস্তা দখলে রাখে ট্রাক। কারওরান বাজারে জ্যামের কারণও ট্রাক। সোনারগাঁও হোটেল চত্বরে এসে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে সবগুলো যান। যে যার ইচ্ছামতো একটু জায়গা পেয়েই গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাংলামটর, ফার্মগেট, মগবাজার থেকে আসা ট্রাক ও অন্যান্য গাড়ি কোনো সিগন্যালই মানেনি। ফলে গভীর রাতে যাত্রীদের প্রায় আড়াই ঘন্টা বসে থাকতে হয় কারওয়ান বাজারে।

কাওরানবাজার রাস্তায় নামানো হচ্ছে পণ্য

গভীর রাতে এ ধরনের জ্যাম এখন প্রায়ই নগরীর কয়েকটি স্পটে দেখা যাচ্ছে। ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার (সোনারগাঁও মোড়), মগবাজার, গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, জনপথ মোড়, মহাখালীর সিগন্যাল পয়েন্টগুলো রাত ১০টার পরেই অরক্ষিত হয়ে পড়ছে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত নগরীতে ট্রাক ঢুকতে পারে না। সন্ধ্যা ৬টার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছুটে আসা ট্রাক নগরীতে প্রবেশ করতে থাকে এবং রাত ১০টার পর নগরীর রাস্তাগুলো পুরোপুরি দখলে চলে যায় ট্রাকের। নগরীর বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে ৮০ থেকে ১০০ কিমি বেগে এসব ট্রাক ধেয়ে চলে। মাঝে মাঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয় নগরবাসী।

রাত ১০টার পর পুরো নগরীর রাস্তাঘাট অরক্ষিত থাকে। ঢাকা মেট্রোপলিটনে ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলের সংখ্যা ১৬৭৫ জন আর সার্জেন্টের সংখ্যা ৪৯৬ জন। নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এরা দুই শিফটে ডিউটি দেয়। সকাল ৭টা থেকে দুপুর আড়াইটা এক শিফট এবং আড়াইটা থেকে রাত ১১টা আরেকটি শিফট। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রাত ১০টার পরেই সার্জেন্ট ও ট্রাফিকরা স্পট ছেড়ে চলে যায়। অর্থাৎ রাত ১০টার পরই নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা। সিগন্যাল বাতি দেখে ট্রাফিক নিয়ম মানার কালচার আমাদের দেশে নেই। এ কারণেই প্রতিটি সিগন্যালস্ট্যান্ডের পাশে দাঁড়াতে হয় একজন ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলকে। অনেক সময় এতেও কাজ হয় না। কারণ ড্রাইভাররা গ্রাহ্য করে না ট্রাফিক কনস্টেবলের কথা। মোড়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সার্জেন্ট থাকলেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় বেপরোয়া যান ও ড্রাইভারকে। তারপরও নিরর্থক জ্বলছে সিগন্যাল বাতি। বছরে অপচয় হচ্ছে এক কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ। যেখানে দিনের বেলায় এ অবস্থা সেখানে রাতের অবস্থা সহজেই বোধগম্য।

রাতে ট্রাফিক পুলিশ না থাকার কারণে সীমিত সংখ্যক যানবাহনই বিশাল জ্যাম বাধিয়ে ফেলে। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি ট্রাফিক দক্ষিণ) আবু মুসা মোঃ ফখরুল ইসলাম খান ২০০০কে বলেন, 'ট্রাফিক নিয়ম না মানাই হচ্ছে রাতের জ্যামের প্রধান কারণ। সবাই চায় আগে যেতে। নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় সবাই। রাত ১১টা পর্যন্ত আমাদের ডিউটি। অবশ্য রাতের জ্যামের কথা চিন্তা করে আমরা কয়েকটি স্পটে রাত ১২টা পর্যন্ত ট্রাফিক পুলিশের ব্যবস্থা করেছি। আসলে রাতের শিফটেও সার্জেন্ট, ট্রাফিক পুলিশ থাকা জরুরি। কিন্তু আমাদের লোকবল একেবারেই কম। এজন্য ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।'

কারওয়ান বাজারে রাতের জ্যামের আরেকটি কারণ হচ্ছে রাস্তার ওপরে ট্রাকগুলোর মালপত্র উঠানো নামানো। কারওয়ান বাজারে আসা ট্রাকগুলো রাস্তার ওপরে মালপত্র নামিয়ে থাকে। মগবাজার থেকে বাংলামটর হয়ে ট্রাকগুলো সোনারগাঁও মোড়ে আসার কথা বাঁ পাশের রাস্তা দিয়ে। কিন্তু ট্রাকগুলো ডান পাশের রাস্তা ধরে শর্টকাটে পৌঁছায় কারওয়ান বাজারে। ডান পাশের রাস্তায় গাড়ির ফ্লো একটু বেশি থাকলেই তখন জ্যাম বেধে যায়।

গভীর রাতে নিয়ম ভঙ্গ করা এসব গাড়িকে ধরার জন্য ট্রাফিক পুলিশের কোনো ধরনের উপযুক্ত যানবাহন নেই। ডিসি ট্রাফিক (দক্ষিণ) আবু মুসা ২০০০কে বলেন, 'রাতের বেলা আমাদের ডিউটি দেয়া রিস্কি। হোন্ডা দিয়ে বেপরোয়া গাড়িকে ধরা সম্ভব না। এজন্য প্রয়োজন পেট্রোল কার। কিন্তু আমাদের সে ধরনের যান নেই।'

ঢাকা মেট্রোপলিটন ট্রাফিক পুলিশের একটি সূত্র জানায়, রাতের এই জ্যামের কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন স্পটে ট্রাফিক পুলিশ দেওয়ার কথা নীতি-নির্ধারণী বৈঠকে উঠানো হবে। উত্তর ও দক্ষিণ মিলিয়ে এ স্পটগুলো হলো– যাত্রাবাড়ী, জনপথ মোড়, মহাখালী, মগবাজার, বাংলামটর মোড়, সোনারগাঁও হোটেল মোড়, ফার্মগেট, মানিক মিয়া এভিনিউ, গাবতলী, গুলশান-২ এবং টঙ্গী ব্রিজ।

বদরুদ্দোজা বাবু

ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

রাতের জ্যামে প্রধান কারণ ট্রাক

বকুল রানীর হত্যা রহস্য

সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ সরকারি শিশু পরিবার কেন্দ্র হাটহাজারীর সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বকুল রানী দে (৪৭) গত ৪ মে সোমবার ভোরে কেন্দ্রের কম্পাউন্ডের একটি রুমে নির্মমভাবে নিহত হন। নিরীহ বকুল রানীর এ হত্যাকান্ডের রহস্য এক সপ্তাহেও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। তবে পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের সন্দেহের তালিকায় তার কয়েকজন সহকর্মীও রয়েছেন।

গত ৪ মে ভোরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্ত দল বকুল রানীকে তার কিচেন স্পেসে কোদাল দিয়ে তার মুখমন্ডল ও মাথায় আক্রমণ করে নির্মমভাবে খুন করে।

কেন্দ্রের শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক সবকিছুর বিশাল দায়িত্ব এক রকম চাপিয়েই দেয়া হয়েছিলো বকুল রানী দে'র ওপর। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে তার প্রতিনিয়তই বাকবিতন্ডা হতো আর্থিক হিসেব নিয়ে। এ প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার একেএম শহীদুল হক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এ পর্যন্ত বকুল রানীর বিরুদ্ধে কোনো নেগেটিভ অভিযোগ বা তথ্য কেউ দেয়নি, আমরাও পাইনি।' গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'তিনি অত্যন্ত সৎ কর্মকর্তা ছিলেন বলেই শত্রু সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিণতিতে এই হত্যাকান্ড।'

'৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের ডামাডোলে ষোড়শী বকুলের বিয়ে হয় ফেব্রুয়ারির দিকে হরিপদ দের সঙ্গে। বিয়ের তিন মাস পর কোনো এক বৈশাখী দিনে হরিপদ ডেকে বললেন, 'বকুল, শার্টটা দাও তো, আমি মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছি!' আর ফিরলেন না। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধরে নিয়েছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করেছেন তার স্বামী। তিনি শহীদ জায়া। তিন মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা বকুল নামলেন জীবনযুদ্ধে।

'৭১-এর শেষ দিকে জন্ম নেয়া কন্যা বিউটি বাবাকে দেখেনি। অভাব-অনটনে মায়ের শাসনে আদরে বেড়ে ওঠে বিউটি। বিউটির বিয়ে হয়েছে কলকাতায়। নিহতের সহকর্মীরা বললেন, বৈরাগীর মতো চলতেন বকুল দে। এতিমখানা দেখতেন, প্রাণ দিয়ে আগলে রাখতেন সন্তানের মতো। তিনি নিজেও এতিম ছিলেন তো। সহকর্মীদের কারো সঙ্গে কখনো হেসে কথা বললেই রটে যেতো বকুলদি... প্রেমে পড়েছেন। তিরিশ বছর এ প্রতিকূলতায় যিনি লড়ে এসেছেন– সততাই নির্মম পুরস্কৃত করলো তাকে এভাবে– মহিলা সহকর্মীদের অঝোর কান্নায় বারবার উচ্চারিত হয় এ উক্তি। ঠিকাদার বাহিনী, শিশু সদনের বড় ভাই (পদের নাম) পদের ৪ জন ক্বচিৎ উপস্থিত থাকা তত্ত্বাবধায়ক এদের সবার সঙ্গেই নানা সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে বাকবিতন্ডা হয়েছে– তার প্রমাণও পেয়েছেন পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ। এখন পর্যন্ত তিনটি ক্লু ধরে গোয়েন্দা বাহিনী এগুচ্ছে বলে জানা যায়। তদন্তের স্বার্থে সেসব গোপন রাখা হয়েছে। পুলিশ সুপার শহীদুল হক বলেন, ডিপার্টমেন্টের কেউ শত্রুতা করে এটা করতে পারে। আমরা একটি বেনামী চিঠি সিজ করেছি যেটা বিভাগীয় প্রধানের বরাবরে লেখা হয়েছে। ডিপার্টমেন্টকে না জানিয়ে মেয়ের কাছে কলকাতায় যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে বকুল রানীর বিরুদ্ধে সেই চিঠিতে, যা ডিপার্টমেন্টের কেউ করেছে এটা নিশ্চিত।

সুমি খান *চট্টগ্রাম থেকে*

বকুল রানী

অবশেষে এরশাদ স্বীকার করলেন

লিখেছেন **সাইফুল হাসান**

এরশাদ পিতা হয়েছেন। পিতা অবশ্য এরশাদ আগেও হয়েছিলেন। তবে এরশাদের সেই পিতা হওয়া নিয়ে বিতর্ক ছিল। তবে এখনকার পিতা হওয়া নিয়ে বিতর্ক না থাকলেও বিতর্ক ছিল বিয়ে নিয়ে। অবশেষে এরশাদ বিয়ে এবং সন্তানের কথা আনুষ্ঠানিকভাবেই ঘোষণা দিলেন। এরশাদের নতুন স্ত্রীর নাম বিদিশা আর সন্তানের নাম এরিক এরশাদ। এরিকের প্রথম জন্মদিন উপলক্ষে এরশাদ ও বিদিশা বারিধারায় তাদের নিজস্ব ফ্ল্যাটে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানেই তারা প্রথম দম্পতি হিসেবে জনসমক্ষে আসেন।

এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারীঘটিত ব্যাপার নিয়ে তিনি আলোচনায় ছিলেন। নারীঘটিত স্ক্যান্ডাল কখনও তার পিছু ছাড়েনি অথবা বলা যায় তিনি সব সময় নারীঘটিত স্ক্যান্ডালের সঙ্গে থেকেছেন। ক্ষমতাচ্যুত হবার পরও তিনি এই স্ক্যান্ডাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। মরিয়ম, জিনাত মোশাররফসহ অসংখ্য নারীর সঙ্গে তার নাম এসেছে। তার এই নারী লিপ্সার কারণে রওশন এরশাদের সঙ্গে ঘর ভাঙারও উপক্রম হয়েছিল কয়েকবার। এ বিষয়টিও পত্রিকায় এসেছে। মজার ব্যাপার হলো এসব স্ক্যান্ডাল কখনও এরশাদ ও তার পরিবার স্বীকার করেনি। কিন্তু সাংবাদিকদের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। কিছুদিন আগে জিনাত মোশাররফ ও এরশাদ পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। সর্বশেষ এরশাদ-বিদিশাকে ঘিরে গুঞ্জন ওঠে। সাধারণ নারী থেকে এরশাদের কল্যাণে বিদিশাও আসতে থাকেন খবর হয়ে। যথারীতি এই সম্পর্কের কথাও এরশাদ বিভিন্ন সময়ে অস্বীকার করেন। এ সম্পর্কে বিদিশা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'তিনি মূলত নির্বাচনের কারণেই আমাদের সম্পর্ক গোপন রেখেছিলেন। আড়াই বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। ইতিমধ্যে আমি তার সন্তানের মা হয়েছি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।'

১১ মার্চ এরিক এরশাদের জন্মদিনে জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন মিশনের কূটনীতিকবৃন্দ ও এরশাদ-বিদিশার পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোকজন উপস্থিত ছিল। জাতীয় পার্টির জিএম গোলাম কাদের ও তার স্ত্রী, এরশাদের ছোট বোন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও রওশন এরশাদ ছিলেন অনুপস্থিত। জানা যায়, বিদিশার চাপেই এরশাদ তাদের সম্পর্কের কথা জনসমক্ষে স্বীকার করতে রাজি হন।

ফ্রি পত্রমিতালি

টোফেল

ভারত

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

বছরে খুন হয় ৩ হাজার ৬ শ' মানুষ

রিপোর্ট করেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

অশান্ত, রক্তাক্ত ও সন্ত্রস্ত জনপদ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। আগের মতোই মানুষের মনে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর শঙ্কা। এখানকার মানুষের ঘুম ভাঙে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ডাকাতির খবর শুনে। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও কান্নার রোল উঠছে স্বজনহারাদের। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে এ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৩ কোটি মানুষকে। যাকে অশনি সংকেত হিসেবেই দেখছেন সবাই।

চরমপন্থি, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্তকবলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত ১২টি জেলার মানুষ কখনই স্বস্তিতে, নির্ভয়ে দিন কাটাতে পারেনি। দেশ স্বাধীনের পর এ অঞ্চলে চরমপন্থিদের অপতৎপরতা শুরু হলে কোথাও না কোথাও প্রায় নিয়মিত বিরতিতে ঘটেছে বিভিন্ন ভয়াবহ ঘটনা। ঘটেছে রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুটপাট, ডাকাতি বা বন্দুক যুদ্ধ। তাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৫ সহস্রাধিক মানুষ। এ অবস্থার হাত থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে রক্ষার জন্য সরকার অন্তত ৩৩বার বিশেষ অপারেশন চালালেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং অতীতে দেখা গেছে, যখনি অপারেশন পরিচালিত হয়েছে, তখনি লাশ পড়েছে বেশি। প্রতি বছর খুন হয়েছে ৩০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত আদম সন্তান। এ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছিল সবসময় সমাজবিরোধীদের হাতেই। এ অবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৯৮-৯৯ সালে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে। গোটা এলাকা তখন নরকপুরীতে পরিণত হয়। ঘটতে থাকে একের পর এক হত্যাকাণ্ড। এ অবস্থার অবসান ঘটাতে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩ মাসব্যাপী কম্বিং অপারেশন শুরু করে। যাকে বলা হয় সর্বকালের সবচেয়ে শক্তিশালী অপারেশন। বিডিআর, পুলিশ, আর্মড পুলিশ, আনসারসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রায় ৪ হাজার সদস্য ঐ অভিযানে অংশ নেয়। ঐ সময় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৩ হাজার ৭৪০ জন তালিকাভুক্ত অপরাধী ছিল। কিন্তু ব্যাপক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শুরু করা ঐ অভিযানটির ফলাফল মোটেই সুখকর হয়নি। অভিযানটি এতোই সুপার ফ্লপ হয়ে যায় যে, স্মরণকালের সেরা এ অভিযানটি চলাকালেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঘটতে থাকে ভয়াবহ ঘটনা। অনেকটা অভিযানের বিরুদ্ধে দুর্বৃত্তরা পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তারাও ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু করে হত্যাযজ্ঞের অভিযান। ১ ডিসেম্বর রাতেই চরমপন্থিরা হত্যা করে যশোরের হাশিমপুরের সর্বহারা হিসেবে পরিচিত মাইনুল ইসলামকে (২৮)। আর এ হত্যাকাণ্ডের বদলা নেয়ার জন্য এক মুহূর্তও সময় নেয়নি প্রতিপক্ষরা। তারা ঐ রাতেই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে হত্যা করে রামকৃষ্ণপুরের বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য আবু হাসানকে। এরপর ৬ ও ৮ ডিসেম্বর যশোরে আরো দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায় ১২ ডিসেম্বরের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। পুলিশ বিশাল বিশাল অভিযান চালিয়ে চরমপন্থি, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত আর তাদের কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্র-শস্ত্র খুঁজে না পেলেও চরমপন্থিরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করে প্রশাসনকে লজ্জা দেয়। এদিন প্রত্যুষে যশোরের সদর ও বাঘারপাড়ার মাঝামাঝি খুনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী শীর্ষ চরমপন্থি আসাদ ও জাকির বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। দুই বাহিনী প্রধানসহ মোট ১১ জন খুন হয় এই যুদ্ধে। যা এখনো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড। এ ঘটনার মাত্র ৩ দিন পর মেহেরপুরে ঘটে আরো একটি হত্যাকাণ্ড। মেহেরপুর সদরে চরমপন্থিরা হত্যা করে ৫ জনকে। তবে এজন্য তারা একটি গুলিও অপচয় করেনি। ৫ জনকেই হত্যা করে গলায় ফাঁস দিয়ে। তারপর ৫টি লাশ ঝুলিয়ে রাখে গাছে। সকালে উঠে এলাকাবাসী এ দৃশ্য দেখে। শেষ পর্যন্ত অভিযানের প্রথম মাসে এ অঞ্চলে খুনের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩-এ। এরপর জানুয়ারিতে একসঙ্গে ৪/৫ জন খুন না হলেও হত্যাযজ্ঞ থেমে থাকেনি। গড়ে প্রতিদিন খুন হয় ২ জন করে। যার মধ্যে অন্তত ২০টি হত্যাকাণ্ড ঘটায় চরমপন্থিরা। এরপর আসে ফেব্রুয়ারি। ২৮ দিনের এ মাসে ১০ জেলায় খুন হয় ৪৭ জন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জাসদ নেতা কাজী আরেফসহ দলীয় অপর ৪ নেতার হত্যাকাণ্ড। ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া জেলার মহম্মদপুর থানার কালিদাসপুরে চরমপন্থিদের ব্রাশফায়ারে নিহত হন তারা। এ ঘটনায় গোটা জাতি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে লজ্জায়। কারণ ৩ মাসব্যাপী অভিযানটি যখন শেষ হয় তখন ১৪৩ জন আদম সন্তান সন্ত্রাসের শিকার হয়ে নিহত। এখানেই শেষ নয়, তাদের ব্যর্থতার ষোলকলা পূর্ণ হয় অভিযান শেষ হওয়ার মাত্র ৬ দিন পর। ৬ মার্চ রাতে যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এ ঘটনার পর সাবেক

প্রতিবাদ

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন এক প্রতিবাদলিপিতে 'সাপ্তাহিক ২০০০' পত্রিকায় 'ছাত্রলীগের তখন এখন' শীর্ষক সংবাদে ছাত্রদল সম্পর্কে এবং আমাকে জড়িয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে আমি তার প্রতিবাদ করছি। প্রতিবেদনে ছাত্রদলের তিনটি গ্রুপের কথা উল্লেখ করে আমাকে একটি গ্রুপে জড়ানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদক একটু নিষ্ঠাবান হলে উপলব্ধি করতে পারতেন ছাত্রদলে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে তবে কোনো গ্রুপিং নেই। দীর্ঘদিন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠনের জন্য কষ্ট করেছি, সংগ্রাম করেছি। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমি মামলা, হামলা, গুলি ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। সংগঠনের বর্তমান অবস্থায় আমার কোনো গ্রুপ করার সুযোগ যেমন নেই, প্রয়োজনও তেমন নেই।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রফিকুল ইসলামের মন্ত্রিত্ব চলে গেলেও দক্ষিণাঞ্চলবাসীর জীবনাতঙ্ক যায়নি। তবে মোহাম্মদ নাসিম নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়ে চরমপন্থিদের বড় একটি অংশের আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন। এ ঘটনায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছিল সাধারণ মানুষের মনে। এরপর এ অঞ্চলের প্রধান চরমপন্থি দল পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি আত্মসমর্পণকে প্রত্যাখ্যান করলেও মোট ২ হাজার ৭৫৫ জন চরমপন্থি ঐ সময় ২ হাজার ১০৯টি অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। ৭ জুন যশোরে, ২ জুলাই খুলনায় ও ২৩ জুলাই কুষ্টিয়ায় চরমপন্থিরা আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণ চলাকালে ও আত্মসমর্পণের পর অভাবনীয়ভাবে অপরাধমূলক ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা কমে যায়। আগে গড়ে যেখনে এ অঞ্চল থেকে ৩ জন করে খুন হতো সেখানে মে, জুন ও জুলাই মাসে ১০ জেলায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে মাত্র ৪৮টি। যার মধ্যে একটিতেও চরমপন্থিরা সংশ্লিষ্ট ছিল না।

সময়ের ব্যবধানে অবস্থার আবার পরিবর্তন ঘটে। আবার ঘটতে থাকে ভয়াবহ সব ঘটনা। আত্মসমর্পণের বাইরে থাকা সন্ত্রাসীরা পুলিশি তৎপরতা শিথিলের সুযোগে একের পর এক ঘটাতে থাকে অঘটন। ২০০০ সালের ১৫ জানুয়ারি খুন হন চরমপন্থিদের আত্মসমর্পণের মূল সমন্বয়ক ঝিনাইদহের মীর ইলিয়াস হোসেন ওরফে দিলীপ। ১৬ জুলাই যশোরের বিশিষ্ট সাংবাদিক শামছুর রহমান, ১১ আগস্ট খুলনার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা এস এম এ রব, ২০ আগস্ট বাগেরহাটের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা কালীদাস বড়াল, ২০০১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খুলনার কাস্টমস ঘাটে খুন হন রূপসা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সরদার হারুন-অর-রশিদ এবং ৪ আগস্ট সরদার হারুনের চাচা ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার সরদার আব্দুর রাজ্জাক। এরপর চলতি বছরের প্রথম ২ মাসেই এ অঞ্চলে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যাতে সাধারণ মানুষ আবার চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ঐ সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে সর্বশেষটি ঘটেছে গত ২ মার্চ। ঐদিন সন্ধ্যারাতে খুন হয়েছেন স্থানীয় দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সাহসী সাংবাদিক হারুন-অর-রশিদ। দুর্বৃত্তরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। ২ জানুয়ারি দুর্বৃত্তরা বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জে এক যুবতীকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। ৪ জানুয়ারি খুলনার ডুমুরিয়ায় গুলিতে প্রাণ হারান আব্দুল মান্নান নামে এক ব্যক্তি। ১০ জানুয়ারি যশোরে খুন হন জিয়া নামে এক যুবক। ২১ জানুয়ারি যশোর থেকে উদ্ধার হয় অজ্ঞাত পরিচয় এক বক্তির লাশ। এর পরদিন খুলনার রূপসায় গুলিতে খুন হন রশিদ শিকদার নামে অপর এক ব্যক্তি। ২৬ জানুয়ারি সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বোমা হামলায় নিহত হন যুবলীগ নেতা তোফায়েল। ২৮ জানুয়ারি কুষ্টিয়ায় সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে মিজানুর রহমান মানুকে ও ১ জানুয়ারি বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার খাগড়বুনিয়া গ্রামে দুর্বৃত্তরা একই বাড়ির ৫ বধূকে ধর্ষণ করে। ১৫ জানুয়ারি ডাকাতরা ধর্ষণ করে একই জেলার বলুইকনি গ্রামের এক গৃহবধূকে। এমনকি পার্শ্ববর্তী সাংকিডাঙ্গা গ্রামে দুর্বৃত্তরা একসঙ্গে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে। ২ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পুলিশ কালু নামে এক যুবকের জবাই করা লাশ উদ্ধার করে। ৪ ফেব্রুয়ারি যশোরের মনিরামপুরে প্রতিদ্বন্দ্বী চরমপন্থিদের ব্রাশফায়ারে নিহত হয় দেবু, বুলবুল, তাপস ও গেদু। তারা খুন হতে পারেন– মনিরামপুর থানা পুলিশের কাছে এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বাড়ি ফেরার পথেই খুন হয়ে যান। ভয়াবহ এ ঘটনার পর গোটা দক্ষিণাঞ্চলে আবার নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি খুলনায় দুর্বৃত্তরা ময়না নামে এক মহিলাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবনে জলদস্যুদের গুলিতে প্রাণ হারায় অজ্ঞাত এক যুবক। গণধর্ষণের শিকার এক মা ১৭ ফেব্রুয়ারি তার ছেলেকে নিয়ে সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে আসার চেষ্টা করলে ধর্ষকরা তাদের অপহরণ করে বেদম প্রহার করে। একই দিন রাতে খুলনার রূপসায় সুজা, কালাম ও জাউরা মাছুম নামে ৩ দুর্বৃত্ত ৩ যুবতীকে অপহরণ করে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি মাগুরায় খুন হন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। ঈদের দিন রাতে কুষ্টিয়ায় চরমপন্থিদের গুলিতে নিহত হন হাসান বিশ্বাস নামে এক যুবক। ২৮ ফেব্রুয়ারি যশোরের নওয়াপাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে রুমি পরিবহনের একটি কোচে (খুলনা মেট্রো-জ-১১-০৫০) ডাকাতি সংঘটিত হয়। এদিন খুলনার রূপসায় বন্দুকযুদ্ধ হয় চরমপন্থিদের মধ্যে। এরপর ২ মার্চ আসে সেই অভিশপ্ত দিন। এদিন সন্ধ্যায় খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাঞ্চল পত্রিকার সাংবাদিক রশিদ খোকন খুন হন দুর্বৃত্তদের হাতে। আর এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে সাধারণ মানুষের মাঝে।